জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত শিল্পী সুমন চট্টোপাধ্যায় ওরফে কবীর সুমন ১৯৪৯ সালে ওড়িশায় জন্মগ্রহণ করেন। যদিও কলকাতাতেই তাঁর দীর্ঘদিনের বসবাস। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির স্নাতক সুমন একাধারে গীতিকার, কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক। কয়েকটি সিনেমায় অভিনয়ও করেছেন তিনি। রাজনীতিতেও তাঁর অবাধ বিচরণ দেখা গিয়েছে। লোকসভার সাংসদ হয়েছিলেন। এক খ্রিস্টান মিশনারিকে হত্যার প্রতিবাদে তিনি ধর্মান্তরিত হন। তখনই তাঁর নাম হয় কবীর সুমন। ২০১৪ সালে তিনি জাতীয় পুরস্কার পান।

শনিবার, ১ চৈত্র ১৪২৫ ■ ৩৯ বর্ষ ■ ২৯৬ সংখ্যা

প্রাচীর ভাঙা জরুরি

চিনের দুর্গম প্রাচীরে আবারও আটকে গেল ভারত। বলা ভালো, ধাক্কা খেল। জইশ-ই-মহম্মদের সুপ্রিম কমান্ডার মাসুদ আজহারকে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের তরফে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু অতীতের মতো এবারও নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্য চিনের 'ভেটো'য় সেই চেষ্টা বানচাল হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বেজিংয়ের কমিউনিস্ট শাসকদের এই পদক্ষেপ রুষ্ট করেছে নয়াদিল্লিকে। অসন্তুষ্ট হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। চিন অবশ্য আগের মতোই ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি দুনিয়ার দেশগুলির ভ্রূকুটিকে পাত্তা দিতে নারাজ। বরং পাকিস্তানের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ও বন্ধুত্বের সামনে যে কোনো বাধাই মানবে না, সেটা গোটা বিশ্বকে আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছে শি জিংপিংয়ের সরকার।

চিন যে বাকিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে রাজি হবে না, তার ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল। কারণ, তারা পুলওয়ামার ঘটনার নিন্দা করলেও তাকে জঙ্গি হামলা আখ্যা দিতে রাজি হয়নি। আবার ২০০৯ থেকে বারবার মাসুদ আজহার ও জইশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠলেও তাতে কর্ণপাত করেননি বেজিংয়ের শাসকরা। ফলে চিন যে ২০০৯, ২০১৬, ২০১৭ সালের মতো এবারও বেঁকে বসবে, তার আঁচ ছিলই। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, সেই আঁচ আগাম পেলেও মোদি সরকার কেন কূটনৈতিক স্তরে চিনের উপর চাপ বাড়ানোর পথে হাঁটেনি?

চিন যে পাকিস্তানের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, সে তো ভারতের অজানা নয়। অথচ চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের থেকে কয়েকশো যোজন এগিয়ে রয়েছে ভারত। প্রতিবছর ভারত-চিন বাণিজ্যের পরিমাণ হু হু করে বাড়ছে। চিনের একাধিক প্রথমসারির মোবাইল নির্মাতা ভারতে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। ভারতে বিক্রি হওয়া প্রতি পাঁচটি স্মার্টফোনের অন্তত তিনটি চিনের সংস্থা। বাচ্চাদের খেলনা থেকে দীপাবলির আলো, গৃহস্থালির টুকিটাকি থেকে কম্পিউটার সরঞ্জাম-সবকিছুই এখন 'মেড ইন চায়না।' বলিউডের একাধিক সিনেমা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে চিনে। সীমান্ত বিবাদ সত্ত্বেও ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গত কয়েক বছরে হু হু করে এগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিংয়ের সঙ্গে দোলনায় দোল খেতে পারেন। সেদেশে গিয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন। অথচ বাস্তব হল, সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে চিনের উপর কূটনৈতিক চাপ দিতে আগাগোড়া ব্যর্থ মোদি সরকার।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একবার বলেছিলেন, প্রতিবেশীর স্বভাব কখনও বদলানো যায় না। দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরে কে অপ্রতিরোধ্য শক্তি, তা নিয়ে বেজিং আর নয়াদিল্লির মধ্যে স্নায়ুর লড়াই চলছে। আর শত্রুর শত্রু আমার মিত্র নীতি মেনে স্বাভাবিককারণেই ইসলামাবাদের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপই বেজিংয়ের নির্দেশ অনুযায়ী চলে। পাকিস্তানের পরিকাঠামো ও সামরিকখাতে উন্নয়নের সবথেকে বড়ো শরিক হল চিন। চিন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর (সিপেক) তৈরির ক্ষেত্রেও ইসলামাবাদের মাথার উপর ছাতা হল বেজিং।

তবে চিন শুধুই বন্ধুত্বের খাতিরে 'শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, পাকিস্তানের ভরসা' এমনটা ভাবা ভুল। চিনের লৌহকপাট ভেদ করে অন্দরের সমস্ত খবর বহির্বিশ্বে না বেরোলেও, জিংজিয়াং প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়কে নিয়ে বেজিংয়ের মাথাব্যথার খবর এখন আর চাপা নেই। উইঘুর সহ অন্যান্য প্রান্তিক মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর চিনের রাষ্ট্রশক্তির উৎপীড়নের ঘটনাও নতুন নয়। চিনের সঙ্গে অলিখিত চুক্তির খাতিরে পাকিস্তান দুনিয়ার নানা প্রান্তের মুসলিমদের দুর্দশা নিয়ে সরব হলেও কোনোদিনও উইঘুরদের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। রাওয়ালপিন্ডিতে ভালো সংখ্যায় উইঘুরের বাস রয়েছে। তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা জিংজিয়াং প্রদেশে চিনের হাতে নিয়মিত নিপীড়নের শিকার হলেও কোনোদিন মুখ খুলতে পারেন না। কারণ তাঁরা জানেন, পাকিস্তানের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হল চিন। নিজেদের দেশের আর্থিক ক্ষতি করে উইঘুরদের স্বার্থ নিয়ে ভাববে না ইসলামাবাদ। আবার চিনও জানে, মাসুদ আজহার, হাফিজ সঈদ, জইশ-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবার মতো সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে সরব হলে উইঘুরদের নিয়ে বিপাকে পড়তে হবে তাদের। তাই দুনিয়ার পরোয়া না করে পাকিস্তান আর চিন পরস্পরের স্বার্থ বজায় রাখার ব্যাপারেই চিন্তিত।

উইঘুরদের উপর চিনের রাষ্ট্রশক্তির দমনপীড়ন নিয়ে ভারত সরব হবে কিনা সেটা কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের এক্তিয়ারে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তান যখন কাশ্মীর ইশ্যুতে চিনকে সঙ্গে নিয়ে বারবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে সরব হয়, তখন তার জবাবে উইঘুরদের উপর নির্যাতনের বিষয়টি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা ভারতের অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। জাপান, ভিয়েতনামের মতো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইতিমধ্যে চিনের উপর চাপ বাড়িয়েছে ভারত। চিনা পণ্য বয়কট করে দেশের সাধারণ ব্যবসায়ীদের বিপাকে না ফেলে কূটনীতির অস্ত্রে কীভাবে চিনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে ফেলা যায়, সেই চিন্তা করা উচিত নয়াদিল্লির।

অমৃতধারা

আধ্যাত্মিকতা অন্তর্জ্ঞানকে বিকশিত করে। এটি জানার আরেকটি মাত্রা। অন্তর্জ্ঞান বিকশিত করার জন্য যোগদান আবশ্যক। কিন্তু যোগদান কেমন করে সম্ভব হবে? প্রথমেই নিজেকে দোষারোপ বন্ধ করতে হবে এবং নিজের প্রশংসা আরম্ভ করতে হবে। যখন তুমি নিজের প্রশংসা করো, তোমার যিনি স্রষ্টা, সেই ঈশ্বরের কাছে সেই প্রশংসা পৌঁছে যায়। সেই কারণে নিজের প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হয়ো না। বুঝেছ? তুমি অন্যদের প্রশংসা করো অথবা নিজের প্রশংসা করো, দুইয়ের পরিণাম একই। একজন যখন বলে 'বাঃ! চমৎকার সাজানো হয়েছে' সে তখন শুধু সাজানোর প্রশংসা করছে না, যে সাজিয়েছে তারও প্রশংসা করছে, সাজানোর জিনিষগুলি যারা প্রস্তুত করেছে তাদেরও প্রশংসা করছে।

কাজেই তোমার প্রশংসা, তোমার অহংকারকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়। তা এরকমভাবে নিজগৃহে ফিরে আসা। ঠিক আছে? এই জ্ঞান হয়তো তোমাদের অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হবে।

–শ্রীশ্রী রবিশংকর

শব্দরঙ্গ ■ ২২৫৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি ঃ ১। শাখের উপরের বৃত্তাকৃতি রেখা ৩। সম্পদ ও ঐশ্বর্য, বৈভব, মহিমা বা সমৃদ্ধি ৫। এঁড়ে বাছুর ৭। কদম ফুলের মতো দেখতে চিনিতে তৈরি নাড়ুবিশেষ ৯। ছোটো বকবিশেষ, কোঁচবক ১১। হিন্দু শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে শ্রাদ্ধকর্তার ষোলোটি দান ১৪। মাদার গাছ ও তার ফল, স্বর্গীয় ফুল ও তার গাছ ১৫। গা, শরীর বা দেহ।

উপর–নীচ ঃ ১। নকল রাখার জন্য খাতা, খাতা বা পাণ্ডুলিপি ২। মহাভারতে উল্লিখিত একটি বনের নাম ৩। প্রকাশ ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, কিরণ বা রাগিণীবিশেষ ৪। পূর্ণচন্দ্র বা পিরবিশেষ ৬। চামড়ায় ছাওয়া তালযন্ত্রবিশেষ ৮। জন্য, নিমিত্ত বা হেতু ১০। কোনো সুদূর অতীতের অজানাকালের ১১। ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ পটহ ১২। বড়ো জলাশয়, সমুদ্র ১৩। কাপড় রং করার জিনিস, প্রীতিকারক বা বারুদ।

সমাধান ■ ২২৫২

পাশাপাশি ঃ ১। খোয়াব ৩। তব ৫। কলি ৬। পলকা ৮। দমক ১০। নিতল ১২। রিসালা ১৪। সুরা ১৫। নক্র ১৬। জিঞ্জির।

উপর–নীচ ঃ ১। খোশামোদ ২। বকবক ৪। পঞ্চাল ৭। কাছি ৯। জারি ১০। নিমরাজি ১১। লম্বোদর ১৩। সাটিন।

সার্বিক প্রাথমিক রোজগার : ইউটোপিয়া না বাস্তব?

আমাদের দেশে ইউবিআই চালু হলে কিনু গোয়ালা, দীনু স্যাকরা, বা গঙ্গারামের কনিষ্ঠ ভাইয়ের জীবনযাত্রায় বিনা পরিশ্রমের নিশ্চিত সার্বিক রোজগার কী কী পরিবর্তন নিয়ে আসে, তা তাবড় সমাজবিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদদের কাছেও নতুন পাঠ হবে নিঃসন্দেহে। লিখেছেন **অতনু বিশ্বাস**।

আচ্ছা, দেশের সমস্ত মানুষকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিলে কেমন হয়? যেটা হবে তাঁর বিনা পরিশ্রমের রোজগার। ধরা যাক, দেশের নাগরিক হিসেবে জন্মানোর জন্য রাষ্ট্র এটা আমাদের প্রাপ্য হিসেবে স্থির করেছে। তবে টাকার পরিমাণটা হয়তো খুব বেশি নয়। মাসে হাজার, বারোশো কিংবা দেড় হাজারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু এই অনুদানটা দেওয়া হবে সব্বাইকে। হরিমুদি থেকে হেড অফিসের বড়োবাবু, গান শুনিয়ে ভিক্ষা করা অন্ধ কানাই থেকে দেশের শীর্ষতম ধনী ব্যক্তি। এবার যার ইচ্ছা নেবে, যার ইচ্ছে নেবে না। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অনুদান এবং পরিসেবার সঙ্গে এই অনুদানের মূল পার্থক্য কিন্তু এটাই। এই অনুদান অবাধ এবং নিঃশর্ত। এবং এটা পরিবার পিছু নয়। জন পিছু। ছেলে-বুড়ো, পুরুষ-নারী, ধনী-দরিদ্র, উচ্চশিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাটা জমা হয়ে যাবে মাসে মাসে। একেই বলে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম (ইউবিআই) বা সার্বিক প্রাথমিক রোজগার। অনেকটা যেন শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো রোজগারকে গুরুত্ব দেওয়া। বা যেন রোজগারকে প্রাথমিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া।

অনেকের অবশ্য অস্বস্তি রয়েছে এই সর্বজনীন অনুদানের বিষয়ে। বিশেষ করে কাজ না করে টাকা রোজগারের এই নিশ্চিন্ত উপায়ে। রাজার অসুখ-এর যে সন্ন্যাসী গাছতলায় বসে প্রকৃতির লীলাখেলা দেখে আর হাসে, কাজ করা দূরের কথা, ভাত মেখে মুখে তোলাতেও যার আলস্য, এই সার্বিক নিশ্চিন্ত রোজগারের মধ্য দিয়ে তাকে কি প্রশ্রয়ই দেওয়া হচ্ছে না? কিংবা অতি সামান্য রোজগেরেরা কি এর ফলে আরও পরিশ্রম-বিমুখ হয়ে পড়বে না? এনিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ রয়েছে। কেউ বলেন, খানিকটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ফলে আসবে পছন্দমতো কাজ বেছে নেওয়ার সুযোগ। কেউ বা আবার রাজার অসুখ-এর সন্ন্যাসীকে প্রশ্রয় দেওয়ারই পক্ষপাতী।

ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের এই আইডিয়াটা কিন্তু আজকের নয়। বরং বেশ পুরোনো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এর উল্লেখ রয়েছে। ষোড়শ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যে ক্রমশ এই চিন্তাধারা দানা বাঁধতে থাকে নতুন করে। ঠিক পাঁচশো বছর আগে, ১৫১৬ সালে লেখা স্যার টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া' বইটিতে আছে ইউবিআই-এর ধারণা। মনে রাখা ভালো যে, প্লেটো বর্ণিত কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য ছিল এই 'ইউটোপিয়া'। আর এখন, একুশ শতকের প্রথম ভাগে, ইউরোপ-আমেরিকা সহ গোটা পৃথিবীই আবার নতুন করে এক ভূত দেখা শুরু করেছে, সেই সঙ্গে নতুন করে এসে পড়েছে ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের চিন্তা। ইউরোপ-আমেরিকায় সেটা অনেকটাই প্রযুক্তির উন্নতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দলে দলে চাকরি হারানোর ভয়ে, আর ভারত কিংবা আফ্রিকার মতো বেশ কিছু দেশে তা দারিদ্র্য দূরীকরণের পথ হিসেবে ভেবে। ভারতে অরবিন্দ সুব্রহ্মণিয়মের ২০১৭ সালের ইকোনমিক রিপোর্ট কিন্তু ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম-কে নতুন করে আলোচনার টেবিলে এনে ফেলেছে। এবং সেই আলোচনাটাকে নিয়ে ঝড় উঠেছে প্রবল ভাবেই।

ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রশাসক এবং রাজনীতিবিদদের হাত ধরে নানা ধরনের আর্থিক অনুদানের প্রকল্প চালু হয়। ঘোষিত হয়। কখনও দেশের কোনো প্রদেশে, কখনও বা কেন্দ্রীয় ভাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষক বা দরিদ্রদের জন্যে। এ ধরনের প্রকল্পগুলি ঠিক ইউবিআই নয়, একে বড়োজোর আধা বা আংশিক ইউবিআই বলা যেতে পারে। 'ইউনিভার্সাল'বা 'সার্বজনীন' শব্দটা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার 'ইনকাম' শব্দটাও রয়েছে এখানে। অর্থনীতিবিদরা অবশ্য এনিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। অমর্ত্য সেন বা জাঁ দ্রেজের মতো অর্থনীতিবিদরা যেমন সন্দিগ্ধ ভারতের জনসাধারণের পরিপক্বতা নিয়ে। বিনা পরিশ্রমে কাঁচা টাকা হাতে পেলে সেই টাকাকে ঠিকঠাক প্রয়োজনে--খাদ্যে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে খরচ করাও কিন্তু সহজ নয়। সেই টাকা নয়ছয় হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই তাই টাকার বদলে খাদ্যে বা অন্যান্য পরিসেবার মাধ্যমে সরকারি অনুদান পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। প্রণব বর্ধনের মতো অর্থনীতিবিদরা আবার নিশ্চিত হতে চান যে, ইউবিআই চালু হওয়া মানে নানাবিধ চালু থাকা অনুদান এবং পরিসেবা যেন বন্ধ না হয়ে যায়।

এটাও ঠিক যে, চালু থাকা নানা পরিসেবা অনেক ক্ষেত্রেই বহুমুখী। যেমন ধরা যাক, মিড ডে মিল। বাচ্চাকে কাজে না ঢুকিয়ে ইস্কুলে পাঠানোর মানসিকতা জোগায় মিড ডে মিল। সেই সঙ্গে রান্না ইত্যাদি কাজে কর্মসংস্থান হয় বেশ কিছু লোকের। একসঙ্গে খেতে বসে বাচ্চারাও নিজেদের সার্বিকভাবে সমাজের অঙ্গ বলে মনে করে। কিন্তু জনপ্রতি বেশ কিছু নগদ টাকা মাসে মাসে ধরিয়ে দিলে, এই সমস্ত সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাচ্চাগুলো ইস্কুলে আসবে কিনা, সেটা একেবারেই নিশ্চিত নয়। কর্মসংস্থানের দিকটাও মাঠে মারা যাবে। অন্যান্য অনেক প্রকল্পেরও এমনই নানারকম সামাজিক প্রভাব রয়েছে। তাই যে প্রকল্পগুলি দেশের নানা প্রান্তে সাফল্য এনে দিয়েছে, তাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে অনেকেই যত্নবান।

এসব প্রশ্ন ওঠার কারণ, এর পিছনে সম্ভাব্য খরচটা বিপুল। দেশের সব লোককে মাসে মাসে নিশ্চিতভাবে বিনা পরিশ্রমে টাকা দিতে গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থের জোগান আসবে কোথা থেকে? ভারতে ২০১১-১২-তে দারিদ্র্যের যে সীমারেখা ঠিক করা হয়েছিল, তা ছিল গ্রামাঞ্চলে জন প্রতি মাসে ৯৭২ টাকা, আর শহরাঞ্চলে মাসে ১,৪০৭ টাকা। ভারতের মতো দেশে সার্বিক প্রাথমিক রোজগারের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা যাতে উন্নতি ঘটে সার্বিক জীবন-যাপনের মানের। তাই জনপ্রতি এই অনুদান যদি সত্যিই দেওয়া হয়, তার পরিমাণ এর চাইতে খুব কম হলে সেটা প্রাথমিক রোজগারের মূল উদ্দেশ্যটাকে খুব একটা সাহায্য করবে না। কিন্তু এই দারিদ্র্য সীমারেখার টাকাটাকেই প্রাথমিক রোজগার হিসেবে দিতে হলে তাতে খরচ হবে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। টাকার অঙ্কটা সত্যিই খুব বেশি। খুব সহজ করে যদি একটা অঙ্ক করা যায়, দেখা যাবে যে, দেশের ১৩৫ কোটি জনতার প্রত্যেকের জন্যে ১,৫০০ টাকা করে মাসিক অনুদান দিতে খরচ হবে দেশের জিডিপি-র ১২ শতাংশ। অনেকেই তাই সন্দিগ্ধ। ইউবিআই চালু হলে দেশের অর্থনীতি ঠিক কোন পথে বাঁক নেবে, তা তো একেবারেই অজানা। দেশে-বিদেশে কয়েক হাজার মানুষের উপর ছোটোখাটো কিছু পাইলট স্টাডির ফলাফল একেবারেই এ প্রেক্ষিতে সম্যক দিশা নির্দেশক হতে পারে না।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ইউবিআই-এর পিছনে খরচ করলে দেশ তার অন্যান্য পরিসেবায় খরচ করার টাকা কোথায় পাবে, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। হাসপাতাল, ইস্কুল, কলেজ, ইত্যাদি বানানোর এবং চালানোর টাকা কি আর রাষ্ট্রের হাতে থাকবে তখন? অবশ্যই যদি না নানারকম কর বসিয়ে অতিরিক্ত রোজগারের পথ তৈরি করা হয়। তাহলে এমন দিন কি আসতে পারে, যখন প্রত্যেক নাগরিককে কিছু (বিনা পরিশ্রমের) মাসিক রোজগারের টাকা দিয়েই রাষ্ট্র তার দায়িত্ব শেষ করল? আর নাগরিকদের প্রতিযোগিতার বাজার থেকে কিনতে হল প্রতিটা পরিসেবা--যেমন সন্তানের জন্যে শিক্ষা কিংবা প্রত্যেকের জন্যে স্বাস্থ্য পরিসেবা? রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ছাতার বাইরের সেই দুনিয়াটা নিঃসন্দেহে অজানা, আর সেই সঙ্গে অস্বস্তিরও। তাই অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পরিসেবাগুলি চালু রাখতে অনেকেই উদ্‌গ্রীব। তবে ইউবিআই চালু হলে এমন যে হবেই, সেটাও কেউ জানে না। বাস্তব অনেক সময়ই চেনা মডেলের ছকে পড়ে না।

আপাতত এই সময়কালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আমেরিকা, আফ্রিকার নানা দেশে, ভারতে এ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। নানা দেশ করে চলেছে পাইলট স্টাডি। কবে, কোথায়, কোন দেশে প্রথম চালু হবে ইউবিআই, জানা নেই তা। তবে কোথাও নিশ্চয়ই। এবং হয়তো খুব শিগ্‌গিরই। ছোটোবেলা থেকেই উনিশ শতকের ফরাসি লেখক আলফোন্সে ডি লামার্টিনের একটা লাইন আমার বেশ পছন্দের--ইউটোপিয়াস আর অফেন জাস্ট প্রিম্যাচিওর ট্রুথস। ইউবিআই-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, টমাস মুরের 'ইউটোপিয়া'ও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয়। আর আমাদের দেশে ইউবিআই চালু হলে কিনু গোয়ালা, দীনু স্যাকরা, বা গঙ্গারামের কনিষ্ঠ ভাইয়ের জীবনযাত্রায় বিনা পরিশ্রমের নিশ্চিত সার্বিক রোজগার কী কী পরিবর্তন নিয়ে আসে, তা তাবড় সমাজবিজ্ঞানী আর অর্থনীতিবিদদের কাছেও নতুন পাঠ হবে নিঃসন্দেহে।

(কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

APPUBABALE@GMAIL.COM

> এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ইউবিআই-এর পিছনে খরচ করলে দেশ তার অন্যান্য পরিসেবায় খরচ করার টাকা কোথায় পাবে, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। হাসপাতাল, ইস্কুল, কলেজ, ইত্যাদি বানানোর এবং চালানোর টাকা কি আর রাষ্ট্রের হাতে থাকবে তখন? অবশ্যই যদি না নানারকম কর বসিয়ে অতিরিক্ত রোজগারের পথ তৈরি করা হয়। তাহলে এমন দিন কি আসতে পারে, যখন প্রত্যেক নাগরিককে কিছু (বিনা পরিশ্রমের) মাসিক রোজগারের টাকা দিয়েই রাষ্ট্র তার দায়িত্ব শেষ করল?

উত্তরের পাঁচালি

■ অঙ্কে অমল

সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুরু তাঁর অঙ্ক-চর্চা। রাতে ঘুমোনোর সময় পর্যন্ত অঙ্কের বই-খাতাই সঙ্গী কোচবিহারের অমল চক্রবর্তীর। অঙ্ক ছাড়া তাঁর জীবন অচল। অমলবাবু কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছের বাসিন্দা। ঘর ভরতি করে সাজানো অঙ্কের বই-খাতা। খুদেদের অঙ্কভীতি দূর করতে ১৭ বছর বয়স থেকে শুরু করেছেন টিউশনি। এখন বয়স ৬১। সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত পড়ুয়াদের নিয়মিত অঙ্ক করান। অঙ্ক কষতে কষতে কখন যে রাত ভোর হয়ে যায় টেরও পান না। সবার অঙ্ক-ভীতি কাটাতে তাঁর দাওয়াই, নিয়মকানুন ঠিকমতো শিখে নিলে কঠিন অঙ্ককে কষা যাবে নিমেষেই। পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পড়ান। কখনও পারিশ্রমিক নিয়ে আবার কখনও তা ছাড়াই। শিশুদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে যথেষ্ট ভূমিকা থাকায় ২০১১ সালে কলকাতায় রাজ্য সরকারের তরফে মিলেছে পুরস্কারও। কী করেন অবসরে? অমলের উত্তর, 'কী আবার, অঙ্ক করি, আর কী!' **ছবি ঃ শিবশংকর সূত্রধর**

••••••••••••••••••••

■ মেখলিগঞ্জের শ্যামল

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা শ্যামল সরকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তবে শিক্ষকতার পেশার বাইরে নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবেও তাঁর বেশ পরিচিতি। নিবিড় যোগ সাহিত্যের সঙ্গেও। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প-কবিতা লেখেন। করেন পুস্তক সমালোচনাও। শ্যামলবাবুর কলমেই প্রথম বই আকারে প্রকাশ পায় মেখলিগঞ্জের ইতিহাস। বইটি মেখলিগঞ্জের মানুষের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর লেখা 'স্মৃতির আলোয় হাড়োয়া' বইটির মাধ্যমে হাড়োয়ার ইতিহাস ও অসংখ্য না জানা কথা সবার সামনে উঠে এসেছে। মেখলিগঞ্জের নাট্যচর্চার ইতিহাসেও তার অবদান অনস্বীকার্য। নয়ের দশকে শ্যামলবাবু নটরাজ অপেরা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি দল স্থাপন করে মেখলিগঞ্জের নাটক ও যাত্রাপালার জগতে বিপ্লব আনেন। জন্মসূত্রে মেখলিগঞ্জের নন। কাজের সূত্রে এখানে এসে বরাবরের জন্য মেখলিগঞ্জেরই হয়ে গিয়েছেন। নাটক লেখা, রিহার্সাল ও সনেটেই আজকাল দিন কাটে মেখলিগঞ্জের শ্যামলের। **ছবি ঃ শুভ্রজিৎ বিশ্বাস**

••••••••••••••••••••

■ বাংলায় রাজকুমার

ঘরোয়া মজলিশে কথা বলেন মাতৃভাষা রাজস্থানি আর হিন্দিতে। আর রাত জেগে বাংলা অক্ষরে লেখার খাতা ভরান কালিয়াগঞ্জ মাড়োয়ারিপট্টির বাসিন্দা রাজকুমার জাজোদিয়া। জন্ম ১৯৫০ সালে অবিভক্ত বাংলাদেশের বগুড়া জেলার জয়পুরহাটে। প্রায় ১৫০-২০০ বছর ধরে পূর্বপুরুষদের বসবাস বঙ্গদেশে। অন্য ব্যবসায় যুক্ত বাবার ব্যবসা দেখভালের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উদ্যোগে চাক্কিপেষার ব্যবসা (আটা কল), কয়লার ডিপোর ব্যবসা শুরু করতে তিনি পাড়ি দেন কালিয়াগঞ্জে। ১৯৬৯ সালে কালিয়াগঞ্জের পার্বতীসুন্দরী উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বেশ কয়েকটি খণ্ডে রচিত উত্তর দিনাজপুরের ইতিহাস-এর লেখক সাহিত্যিক ধনঞ্জয় রায়ের অনুপ্রেরণায় শুরু করেন বাংলা সাহিত্য সাধনা। তাঁর সংগ্রহের বইগুলির মধ্যে অন্যতম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ভারতকোষ (পাঁচটি খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস সংসদ, বাংলা অভিধান ও ভারত তথা বিশ্বের মানচিত্র। প্রথম লেখা দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর এগিয়ে চলেছেন নিজের লক্ষ্যে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার জনমত বিভাগে লিখছেন ১৯৯৭ সাল থেকে। মূলত প্রবন্ধ লেখাতেই সিদ্ধহস্ত। প্রবন্ধের বই লিখেছেন 'উত্তরবঙ্গের মাড়োয়ারি সমাজ'। ইংরেজিতে লেখা তাঁর 'ওয়ান্ডার্স অফ হেরিটেজ নেমস' অনবদ্য। লেখার গুণে পেয়েছেন উত্তরবঙ্গ গুণীজন সংবর্ধনা। সদস্য হিসেবে যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ (কলকাতা) ও ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস (দিল্লি)-এ। **ছবি ঃ অজিত ঘোষ**

••••••••••••••••••••

■ কবিতায় কিশোর

ইনটারনেট মানেই দিনভর চ্যাটিং, আড্ডা? মোটেও নয়। কোচবিহারের শিক্ষক-কবি কিশোর মজুমদারের বিশ্বাস এমনটাই। 'ফাঁকা পকেটে প্রেমের গল্প', 'ভালো থাকিস খোকা', 'সেই হাত কোথায়?', 'আমিও পারি'-র মতো গুচ্ছখানেক মনোগ্রাহী কবিতার ভিডিয়ো নিয়ে তিনি হাজির এই অন্তর্জালেই। ইউটিউবে গিয়ে তাঁর নাম লিখে সার্চ করলেই মিলবে কিশোরের হদিস। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক সংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছে ২২ হাজারের গণ্ডি। পিয়াসি চক্রবর্তীর কণ্ঠে কিশোরের 'আমিও পারি' কবিতাটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল। ১৩ লক্ষেরও বেশিবার অনেকে মিলে ভিডিয়োটি দেখেছেন। কিশোরের জনপ্রিয় কবিতাগুলি মিলবে তাঁর নিজস্ব ডট কমেও। রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কিশোরের 'বাংলা মা ও বাংলা মা' বা 'দিনকে দিলে আলোর চিঠি'-র মতো গানগুলিও দর্শক-শ্রোতাদের ভালোবাসা কুড়িয়েছে বিস্তর। **ছবি ঃ তুষার দেব**

••••••••••••••••••••

■ যাত্রার গৌতম

শৈশব থেকেই যাত্রাপালার প্রতি টানটা তাঁর অদম্য। এই টানেই কিশোর বয়স থেকে এলাকায় বেশ পরিচিত গৌতম সরকার। দিনহাটার ছোটো আটিয়াবাড়ির বাসিন্দা গৌতমবাবু লেখাপড়ার পাশাপাশি যাত্রাগানকে বেছে নিলেও সংসারের চাপে পরবর্তী জীবনে অবশ্য বেছে নিয়েছিলেন স্রেফ গানবাজনাকে। সেটা ছিল ছয়ের দশক। আজ সেদিনের কথা বলতে গিয়ে তাঁর কিছুটা মন খারাপ। 'তখন মফস্‌সল থেকে সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ কোথায়? তখন বাড়ি থেকে লুকিয়ে যাত্রার রিহার্সাল করতাম।' তীর্থ যাত্রা দলের শিল্পী নির্মল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় থাকার সুবাদে কলকাতায় গিয়েও যাত্রা করেছেন। একসময় স্বাস্থ্য দপ্তরে চাকরি করেছেন। আজও মনেপ্রাণে যাত্রাশিল্পকে ভালোবাসেন। শরীরের ভারে হয়তো মঞ্চে থাকেন না, কিন্তু এখনও কেউ এলে অভিনয়টা বুঝিয়ে দেন। ৭০ ছুঁই ছুঁই মানুষটির আক্ষেপ, যাত্রা আজও মানুষকে টানলেও যাত্রাশিল্পীরা আজও অবহেলিতই রয়ে গিয়েছেন। তবুও একদিন দিনবদলের স্বপ্ন দেখেন মানুষটি। **ছবি ঃ শুভাশিস দাস**

••••••••••••••••••••

■ ভাওয়াইয়ায় সঞ্জীব

ইতিহাসের বইয়ে সেই রবার্ট ব্রুস নামে রাজার কথাটা মনে পড়ে? সেই যে যুদ্ধে পর পর ছয়বার হেরে গিয়েও হাল না ছাড়া? সপ্তমবার অবশ্য ব্যর্থতা নয়, এসেছিল সাফল্য। কুমারগ্রামের সঞ্জীব দাসের জীবনেও ঘটনা হুবহু একই। নিয়ম করে রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েও ব্যর্থ হয়েছেন পর পর ছয় বার। সেই স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্টের মতোই। এবারে ২৯তম রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় খোঁয়ারডাঙ্গা নিবাসী সঞ্জীবই অবশ্য সেরার সেরা। প্রতিযোগিতায় ভাওয়াইয়ার চটকা গান গেয়ে তিনি বিচারকদের মুগ্ধ করেন। রাজ্যসেরা হিসাবে প্রাপ্তি ট্রফি তো বটেই, এছাড়া শংসাপত্র এবং ২০ হাজার টাকার চেক। জানাচ্ছেন, ক্রমাগত ব্যর্থ হলেও হাল না ছাড়ার মন্ত্রেই বিশ্বাসী বরাবর। নিয়ম করে সকাল-সন্ধ্যায় তালিম, মাঝেমধ্যেই বাড়িতে ভাওয়াইয়ার জলসা। সেই সুবাদেই সাফল্য। বাবার কাছে গান শেখা। ঢোল, দোতারা দারুণ বাজান। রায়ডাক-সংকোশ ভাওয়াইয়া সংগীত মহাবিদ্যালয়ের গানের শিক্ষক লালন দাস বলছেন, সঞ্জীব আমাদের গর্ব। শুনে গর্বের হাসি হাসছেন সঞ্জীব-জননী শুকেশ্বরী। **ছবি ঃ গৌতম সরকার**

••••••••••••••••••••

■ স্মৃতির আড়ালে

শহিদ হরিদাস নাগ ছিলেন আলিপুরদুয়ারের ভূমিপুত্র। উত্তরের মানুষ হলেও তাঁর কথা আমাদের অনেকেরই অজানা। সেনাবাহিনীর সেভেন গার্ডের অন্তর্ভুক্ত ১৩৬৫২৮৭৯ ব্যাচ নম্বরের এই লড়াকু সৈনিক ১৯৭১ সালের প্রথম কারগিল যুদ্ধে শহিদ হন। শত্রুপক্ষের আগ্রাসন থেকে কারগিল এলাকাকে মুক্ত করে তিনি ও অন্য সৈনিকরা মিলে স্বাধীন ভূখণ্ডে দেশের জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন। সেই সেনানীদের অন্যতম হরিদাস প্রবল বিক্রম দেখিয়ে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি ধ্বংস করেছিলেন। আচমকাই শত্রুদের গ্রেনেড হামলায় তিনি শহিদ হন। তাঁর এহেন বীরত্ব প্রদর্শনের জেরে হরিদাসবাবুর স্ত্রী মীরারানিদেবীর হাতে বীরচক্র পদক তুলে দিয়েছিলেন দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। তাঁদের সন্তানরাও হরিদাসবাবুর মতোই দেশসেবার কাজে এগিয়ে আসবে বলে আশা করেন হরিদাসবাবুর দুই মেয়ে শেলি ও সুদীপ্তা।

••••••••••••••••••••

■ তরুণ কবি

সবে ২৫-এ পা। এর মধ্যেই জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত টুকলিসারি গ্রামের বাসিন্দা সুব্রত রায়ের তিন-তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। 'কয়েকটি পাতা', 'জ্যোৎস্না' ও 'রূপসি টয়ট্রেন' নামে এই তিনটি বই ইতিমধ্যেই কবিতাপ্রেমীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বাংলার পাশাপাশি রাজবংশী/কামতাপুরি ভাষায় কবিতা লেখাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। উত্তরমন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য। অর্জন, প্রবাহ তিস্তা-তোর্ষার মতো নানা পত্রিকার পাশাপাশি ইতিমধ্যেই প্রথম সারির বেশ কয়েকটি পত্রিকাতেও লেখালেখি সারা। জমিতে লুকিয়ে থাকা জীবন প্রাণ পায় তাঁর কলমে। সুব্রতর কবিতা ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি আদায় শুরু করেছে। এই সুবাদেই সম্প্রতি এলাকার এক স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তীতে তিনি সম্মানিত হলেন। জীবন এগোবে এভাবেই, স্বপ্ন দেখছেন তরুণ কবি। **ছবি ঃ মনোজকুমার রায়**

••••••••••••••••••••

■ সাহিত্যে জুঁই

জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই) ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা তিস্তাকন্যা-র সম্পাদক। সাহিত্যপ্রীতি সেই ছোটোবেলা থেকেই। কবিতা তো বটেই, লেখার হাত খুবই পাকা গল্প-কবিতা-ফিচারেও। কবি হিসাবে স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই জুটেছে নক্ষত্রানী সম্মান। মানুষের জীবনসংগ্রামে ভীষণভাবে হন প্রভাবিত। কলমের ডগা দিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে পাতায় পাতায়। তথ্যকেন্দ্র, সাঁকো, মুজনাই, বাতায়ন, হরিণ সহ উত্তর ও দক্ষিণের বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখেন। ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে অসম, বাংলাদেশের নানা দৈনিকে। প্রিয় কবি জয় গোস্বামী। ছোটোগল্পে আদর্শ আমাদের রবিঠাকুর। উত্তরের এই তরুণ কবি এখানকার উঠতি সাহিত্যিকদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন। **ছবি ঃ মানবেন্দ্র দাস**

উত্তরের পাঁচালিতে লিখতে চান? অভিনব যেকোনো বিষয়ের উপর অনধিক ১৫০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com -এ।